মনের মুখ

পার্থ রায়চৌধুরী

ব্যালকনিতে নিজের প্রিয় দোলনায় ল্যাপটল নিয়ে বসেছিল পারমিতা। রবিবার। নিঝুম দুপুর। কাজপাগল শহর এখন বিশ্রামের অতলান্তে মগ্ন। পারমিতার এটাও এক রকমের বিশ্রাম। অচেনা মানুষের সাথে অপরিচয়ের গন্ডি ভেঙে দেওয়া। তাদের কথা শোনা-জানা। মতামত দেওয়া। খারাপ লাগে না, একলা একজন মানুষ যখন হাজার জনের মন ছুঁতে পারে।

অবশ্য, নিছকই সময় কাটানো নয়। এটা তার পেশাকেও সাহায্য করে। একজন দক্ষ কাউন্সেলর হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি আছে পারমিতার। একটা টেলিফিল্মে মুখ দেখানোর সুবাদে কিছুটা জনরিয়তাও। দূরের মানুষ তো বটেই, হাতে গোনা কাছের মানুষ যে ক'জন তারাও পারমিতাকে ভরসা করে। সময়বিশেষে বহু চুলপাকা অভিজ্ঞ বৃদ্ধদেরও ছুটে আসতে হয় এই সাতাশ বছরের মেয়েটার কাছে। রণজয় বলে– তার নাকি থট রিডিংয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা বয়েছে। ফোনে গলা শোনামাত্র বুঝে নেয় রণজয়ের মুড কেমন, সে ঠিক কী বলতে চায়। আজকাল তাই খুব ভেবেচিন্তে কথা বলে রণজয়। মনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলে চেনা মানুষগুলো কি দূরে সরে যায়? হয়তো বা!

আনমনে ভাবতে ভাবতেই মেলগুলো চেক করছিল পারমিতা। বেশির ভাগই 'ওকে ছাড়া থাকতে পারি না' 'তাকে একবার না দেখলে সারাদিন খারাপ যায়' 'সে কেন এত বদলে গেল'। এইসব। অত্যন্ত জটিল এবং ব্যক্তিগত সমস্যাও কিছু থাকে। তবে সেগুলো কম। এসব ক্ষেত্রে চট করে হাল বাতলে দেওয়া যায় না। দিলেই বা কতটুকু কাজ হয় কে তার খবর রাখে! তবু মানুষ পরামর্শ চায়। চায় এমন একজনকে যে তার পথভোলা গন্তব্যের হদিশ দিতে পারে।

ল্যাপটপ বন্ধ করে পারমিতা ঘরে এল। টেবিলের ওপর একগাদা পোস্টকার্ড ছড়ানো। একটা বিখ্যাত রেডিও স্টেশনের 'ফোন ইন' অনুষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহেই তাকে সমাধানের সূত্র দিতে হয়। সরাসরি যারা লাইনে আসতে চায় না তারা চিঠি লিখে জানায়। এগুলো সেইসব সমস্যা সংক্রান্ত চিঠিপত্র। জীবনের একেকটা বিভ্রান্ত মুহূর্তের অক্ষরমালা।

নড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটা পোস্টকার্ডে চোখ আটকে গেল পারমিতার। সুন্দর গোছানো মেয়েলি হাতের লেখা। এতটুকু জড়তা কিংবা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠেনি তার অক্ষরে। বোঝা যায়– নিজের সমস্যাকে মেয়েটা খুব গুরুত্ব দিয়ে যত্নের সাথে দেখছে। আগ্রহ বেড়ে গেল পারমিতার। চিঠিটা পড়তে যাবে, এমন সময় ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠল। ধরার আগেই কেটে গেল প্রথমবার। পরক্ষণেই আবার রিং। দু'বার 'হ্যালো' বলার পরেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। রেখে দেবে কিনা ভাবছে, তখনই ফুটে উঠল একটা মহিলা কণ্ঠস্বর। ভেজা ভেজা ধরা গলা।

–হ্যালো! পারমিতা বলছেন?

–বলছি। কী ব্যাপার বলুন?

–আ- আসলে– আমি মানে– একটা সমস্যায় পড়ে ফোন করেছি। কেটে কেটে যাচ্ছে কথাগুলো। মহিলার বয়েস আন্দাজ পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। সংকুচিত ভাব। খুব থেমে থেমে ভেবেচিন্তে বললেন মহিলা। –আমার ছেলের ব্যাপারে একটু কথা বলার ছিল, একবার আপনার সাথে দেখা করতে চাই।

–কত বয়েস আপনার ছেলের? শোনার ফাঁকেই টুক করে প্রশ্নটা করে ফেলল পারমিতা। মহিলা এবার যেন একটু ভরসা পেলেন। ঝরঝর করে বলতে শুরু করলেন– উনিশ বছরে পড়ল। ওকে নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে পারমিতা। আপনি ছাড়া কারও কাছেই এর সমাধান নেই। শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমার ছেলে–

–দাঁড়ান দাঁড়ান, এক মিনিট। পারমিতা থামিয়ে দিল মহিলাকে। এভাবে ফোনে তো সব কথা হয় না। আপনি কবে আসতে চান বলুন। আমি নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনব।

–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ কিংবা কাল। বললেন মহিলা।

–ঠিক আছে। আপনি কাল সকাল দশটায় আসুন। ভালো কথা, কোত্থেকে বলছেন আর আপনার নামটা আমাকে একটু বলুন।

–সুমনা হালদার। বালিগঞ্জ স্টেশন রোড। আমার ছেলে শুভ। ও ছাড়া আমার কেউ নেই। হঠাৎ থেমে গেলেন মহিলা। লাইনটাও সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে হাতের চিঠিটায় মন দিল পারমিতা। দুর্গাপুর থেকে লিখেছে তানিয়া। সতেরো বছরের একটা মেয়ে। বাড়িতে পেইংগেস্ট থাকতে আসা একটা ছেলেকে মন দিয়ে ফেলেছে। কোনো কিছু না ভেবেই। নিজের সুন্দর ব্যবহারে ছেলেটা শুধু তাকেই নয়, মুগ্ধ করে ফেলেছিল তার বাবা-মাকেও। মেয়েটার বয়সে অল্প, অসংযত আবেগ। ছেলেটা সুযোগ হাতছাড়া করেনি। তার শরীরটাও আদায় করেছে। তারপর হঠাৎ চাকরির পোস্টিংয়ের খবর দিয়ে এক্কেবারে ধাঁ? যাওয়ার আগে অবশ্য পথটা পরিষ্কার করে গেছে। মেয়েটাকে নম্রভাবে বুঝিয়েছে– যা ঘটেছে সেটা অ্যাক্সিডেন্ট অতএব ভুলে যেতে। পরবর্তী এক বছর ধরে মনের এক অচেনা অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে মেয়েটা, মানে তানিয়া।

চিঠিটায় দু-একবার চোখ বুলিয়ে পারমিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নিজের তৈরি করা সমস্যার কাছে মানুষ নিজেই কত অসহায়। সমাধানের পথটা অজান্তেই তারা বন্ধ করে রাখে। ঠিক এই জন্যেই তো পারমিতাকে প্রয়োজন। হাতের কাছে ফেলে রাখা চিঠিটা জোর করে হাতে তুলে নেয়।

উত্তরটা ভাবতে বেশি সময় লাগে না। নোটপ্যাডটা কাছে টেনে পারমিতা। লিখতে গিয়েই তার মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। গোলমালের শব্দ। তার জানালার ঠিক নীচেই। পর্দা সরিয়ে উঁকি দেয় পারমিতা। বাড়ির কেয়ারটেকার দুর্যোধন। রাস্তার দু-একজন লোকের সাথে জটলা

পাকিয়ে চিৎকার করে বলাবলি করছে কিছু।

—কী ব্যাপার দুর্যোধন! এত চেঁচামেচি কিসের?

দুর্যোধন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

—একটুর জন্য ফসকে গেল দিদি। আজ ধরেই ফেলেছিলাম ছেলেটাকে।

—কোন ছেলেটা?

—জানি না দিদি। এলাকার কেউ নয়। তিন দিন ধরে ফলো করছি— বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করে। আমি একটু বাইরে গেছিলাম। এসে দেখি আপনার জানালার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কে জানে কী মতলব!

পাশ থেকে একজন ফুট কাটল, পাড়ায় যা চুরিচামারি হচ্ছে আজকাল।

—আরে না না, চোরটোর নয়। চোখ পাকিয়ে যাত্রার ঢঙে বলল দুর্যোধন—

পারমিতার ভুরু কুঁচকে ওঠে। বিরক্তির সাথে টেনে দেয় পর্দাটা। রাজ্যের উটকো ঝামেলা যত। নিশ্চিন্তে বসে একটু ভাববার জো নেই!

টেবিলের ওপর নোটপ্যাডের সাদা পাতা। খোলা পেনটা অধীর অপেক্ষায়। ওরা ভাষা চাইছে। উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষায় তানিয়া। সব ছুট্‌কো-ছাটকা ব্যাপারে মাথা দিলে তার চলবে না। পারমিতা পেনটা হাতে তুলে নেয়। একটা মেয়ের সমস্যার গভীরে তলিয়ে যায় চারপাশের সব কিছু। মিনিট সেকেন্ডের হিসেবে থাকে না। পাতায় ভেসে উঠতে থাকে আশা-ভরসা-সান্ত্বনা। তারপর হঠাৎ এক সময় থমকে যায় পারমিতার হাত। ফোনটা একটানা আর্তনাদ করছে।

ওপারে সেই মহিলা। সুমনা হালদার। —পারমিতা, কাল নয়, আমি আজই আপনার কাছে যেতে চাই। আপনি না করবেন না। সবকিছু আপনাকে বলা দরকার এক্ষুনি। ভীষণ ভয় হচ্ছে— শুভ একটা কিছু করে ফেলবে— আপনার জন্য পারমিতা! শুধু আপনার জন্য!

দুই

একতলার ড্রয়িংরুমে পাথরের মতো বসে পারমিতা। হাতে কফির কাপ। চোখ দুটো সুমনা হালদারের মুখের ওপর স্থির। মহিলা বিধবা। একমাত্র ছেলে। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাটা শুভর একার নয়। সমস্যার সাথে জড়িয়ে গেছে সে নিজে। স্তব্ধ হয়ে গেছে তার মুখের ভাষা। শাড়ির আঁচল খুঁটতে খুঁটতে মুখ তুললেন সুমনা। —প্রথমে ব্যাপারটা হাল্কাভাবেই নিয়েছিলাম। রেডিওতে আপনি যে প্রোগ্রামটা করছেন, সেটা আমিও মাঝে মাঝে শুনেছি। আপনার কথা শুনতে শুভর ভালো লাগে। আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের যেমন লাগে তেমনই। অতটা গুরুত্ব দিইনি এমনকী শুধুমাত্র আপনার সাথে কথা বলার জন্য মনগড়া সমস্যা বানিয়ে দু-একবার আপনাকে ফোনও করেছে। সেটা ওর কাছেই জেনেছিলাম। তবু কিছু বলিনি। অল্পবয়সী ছেলের মাথায় এরকম কত হুজুগ চাপে। এই ভেবে উড়িয়ে দিয়েছি।

কিন্তু আস্তে আস্তে লক্ষ করলাম ক্রমশ ওকে একটা নেশায় পেয়ে বসেছে। আপনার প্রোগ্রাম শোনার জন্য প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কলেজ কামাই করে বাড়িতে বসে থাকে। ফোনে আপনার গলা রেকর্ড করেছে। দিন নেই রাত নেই সেটা বাজিয়ে কানে চেপে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'তুমি বুঝবে না মা, পারমিতা আমার কাছে কতখানি!' সেদিনই প্রথম খটকা লাগল। এ আর কী ধরনের পাগলামি! ওর বই খাতা ঘেঁটে একদিন কতগুলো টুকরো কাগজ পেলাম। খবরের কাগজ থেকে কাটা। আপনি যেসব প্রশ্নের উত্তর দেন সেইসব।

মহিলা একটু থামেন। পারমিতা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ শুনে যায়। —সেই থেকে ওর ওপর একটু বেশিই নজর রাখতে শুরু করি। গত মাসে আপনার ছবিসমেত একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল। যা ভেবেছি তাই, দেখলাম পেপারের ছবির অংশটা কাটা, পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে। ডাকাডাকি করলেও সাড়া নেই। গিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। চাদর সরিয়ে চমকে উঠলাম! কি দেখলাম জানেন?

পারমিতা সোজা হয়ে বসে। কফি জল হয়ে গেছে। কাপটা নামিয়ে রেখে বলে,— কী?

—হাত চিরে আপনার নাম লিখেছে। চাদরে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। বালিশের নীচ থেকে বেরোল আপনার সেই ছবিটা। আপনিই বলুন, এরপর কোন মা নিজেকে সামলাতে পারে?

আজকাল ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে। কলেজে যাচ্ছি বলে বেরোয়। অথচ আমি খবর পাই ও যায়নি। কোথায় ঘুরে বেড়ায় তা হলে? আজও কোচিংয়ে যাওয়ার নাম করে তিনটের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এক ঘন্টা পরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি। জানতে চাইছি কি হল, সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে গিয়ে বকাবকি করলাম অনেকক্ষণ। রাগের মাথায় আপনার সম্পর্কে দু-একটা কটু মন্তব্য করে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে শুভ দরজা খুলে মেজাজ দেখাতে শুরু করে। জিনিসপত্র টেনেহিঁচড়ে ফেলে দেয়।

আমি বারবার ওকে আগলে রেখেছি। ও তো কোনোদিন এমন ছিল না। আজ বাধ্য হয়েছি আপনার কাছে ছুটে আসতে। আপনি কিছু একটা করুন।

সুমনা চোখ মোছেন। পারমিতা জলের গ্লাসের ঢাকনা সরিয়ে তার হাতে তলে দেয়। কী বলবে কিছুই ভেবে পায় না। এ ধরনের সমস্যা অজানা নয়। কিন্তু নিজে ব্যক্তিগতভাবে মুখোমুখি হওয়া এই প্রথম। স্বেচ্ছায় নিজেকে সবার সামনে মেলে ধরেছে কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ আলাদা! জলের গ্লাস হাতে নিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সুমনা। কিছু একটা শোনার আশায়।

—শুভ, মানে আপনার ছেলের মোবাইল নম্বরটা আমাকে দিন। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কথা দিচ্ছি, আপনার ছেলেকে আমিই ফিরিয়ে দেব। তবে একটা কথা— এরপর ওর কোনো সমস্যায় ওকে নিয়ে আপনি হয়তো আমার কাছে আর আসতে পারবেন না।

ফোন নম্বরটা দিয়ে ধীরেসুস্থে চলে গেলেন সুমনা। পারমিতা বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল ছেটালো ভালো করে। আয়নার ফ্রেমে আঁটা নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ঘরের এসি চালিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। সাদা পাতায় তানিয়ার

প্রশ্নের অসমাপ্ত উত্তর। 'চলে যাওয়ার জন্যেই যে আসে, তাকে ফেরানো যায় না।' ব্যাস, আর কিছু লেখা হয়নি। প্যাডটা মুড়ে রেখে আলো নিভিয়ে দেয় পারমিতা।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল হুঁশ নেই। কিচিরমিচির রিং টোন ঘুমটা ভালিয়ে দিল। রণজয়ের নম্বর দেখেই সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল পারমিতা। –অ্যাই শোনো না, আমি আজ তোমাকেই ফোন করব ভাবছিলাম। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার!

রণজয় হাসল। –বাব্বা! সাইকোলজিস্ট পারমিতারও তা হলে আমার মতো চুনোপুঁটিকে দরকার হয়

–ক্যাবলামি করো না রণজয়! প্রবলেমটা সিরিয়াস।

–হম্, তা তো বুঝতেই পারছি। রাত্তিরে ফোন করছ যখন– বান্দা হাজির হয়ে যাবে।

–থাক থাক, অত উপকার করতে হবে না। তুমি কালকের দিনটা একটু অফ রেখো। তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যাব।

তিন

পরদিন ঠিক সন্ধ্যেবেলায় পারমিতার গেটের কাছে এসে দাঁড়াল শুভ। তাকে দেখেই গেট খুলে দিল দুর্যোধন। একতলার ভেজানো দরজাটা একটু ঠেলে বেলটা বাজিয়ে দিল। তারপর চোখের ইশারায় শুভকে বলল ভেতরে যেতে।

ভেতরের ঘরে তৈরিই ছিল পারমিতা। স্বচ্ছ পর্দার ওপর ছায়া দেখতেই রিনরিনে গলায় বলে উঠল, ওয়েলকাম শুভ। চলে এস।

ঘরে হালকা নীলাভ আলো। সেন্টার টেবিলে একটা পা তুলে সোফায় বসে পারমিতা। পায়ের কাছেই রাখা একটা বোতল। হাতে ধরা আধভর্তি ওয়াইন গ্লাস। ঘাড়টা ইষৎ হেলানো। মুখের একপাশে এলোমেলো ছড়িয়ে খোলা চুলের দু-একটা গুচ্ছ। পরনে বেগুনি রঙের ঢিলেঢালা হাউসকোট। ঠোঁটে তেমনি রঙের লিপস্টিক। ঘরের নীলচে আলোর সাথে মিশে একটা নতুন রং তৈরি করেছে। রংটা যে ঠিক কী তা বোঝা যায় না। শুধু নজর আটকে যায়। সমস্ত ভাবনা এসে জড়ো হয় চোখে। শুভর অবস্থাও তাই। পারমিতার সামনে দাঁড়িয়ে স্থবির।

–কী হল, বসো!

শুভ ঠিক মুখোমুখি বসে না। ডান দিকের সোফাটায় কোনাকুনি বসে। সেই লহমায় তাকে ভালো করে দেখে নেয় পারমিতা। উনিশের সদ্য ফুটে ওঠা যৌবন। ফ্যাকাসে রুক্ষ জিনস। টিশার্টের কলারে অগোছালো ব্যস্ততার ঢেউ। না-কামানো হালকা দাড়ি। চোখে স্বপ্নালু ঘোর। সেই ঘোরে নিজের অস্পষ্ট প্রতিবিম্বের কল্পনা পারমিতাকেই যেন আচ্ছন্ন করে দিতে চায়। তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। পরক্ষণেই সচেতন হয়ে সে ঠিক করে নেয় পরবর্তী পদক্ষেপ।

গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে অযথাই হেসে নড়েচড়ে বসে। আদর মাখানো কণ্ঠস্বরে ফেনিয়ে ওঠে হাল্কা উচ্ছ্বাস। –কীভাবে যে আমি তোমার নম্বর জোগাড় করেছি তুমি ভাবতেই পারবে না! রোজ কত নম্বর হাতে আসে আর যায়। ডিলিট করতে কয়েক সেকেন্ড লাগে। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। সবাই তো কাছাকাছি আসতে চায় না, তাই না!

মুহূর্ত চোখাচোখি। তাতেই পারমিতা আশ্চর্য হয়ে যায়! শুভুর চাহনিতে সংশয়ের কোনো চিহ্ন নেই! এতক্ষণ সে শুধু দেখে যাচ্ছিল। এবার একটা অদ্ভুত কান্ড করল। যেটা পারমিতা ভাবেনি। পিঠের ব্যাগ থেকে বার করল একটা গোলাপের স্টিক। নানা রঙের গোলাপ দিয়ে সাজানো। বেচারা বোধহয় ঠিক করতে পারেনি কী রঙের গোলাপ মানানসই হবে।

ফুলগুলো হাতে দিয়ে শুভ একটা গ্রিটিংস কার্ড রাখে টেবিলের ওপর। এই প্রথম মুখ খোলে। –আমি চলে গেলে এটা তুমি দেখো। অনেক রাত জেগে তোমার জন্য বানিয়েছি। পারমিতা ফুল সমেত কার্ডটা জড়ো করে রাখে টেবিলের একধারে। তারপর মুখোমুখি এসে বসে? –বলো শুভ! তোমার কথা বলো। কী পেয়েছ তুমি আমার মধ্যে? প্লিজ! আমি শুনতে চাই।

পারমিতার গাঢ় কণ্ঠস্বরে আচ্ছন্নের মতো নিজেকে হারিয়ে ফেলে শুভ? –যেদিন টিভিতে প্রথমে তোমাকে দেখলাম, সেদিন মনে হয়েছিল তোমাকে আমি চিনি। তোমার গলাটা শুনলেই আমার ভেতরে কী যেন হয়! আমি বুঝতে পারি না, মনে করতে পারি না কোথায় শুনেছি। শুধু যখন আমি কোনো কারণে দুঃখ পাই, মা যদিও জানে না– কেউ জানে না, সবাই হাসাহাসি করে– তোমার কথা শুনলে আমার মন ভালো হয়ে যায়। তখন কারও কথা মনে থাকে না। মনে হয়–

–কী মনে হয়?

–মনে হয় তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। কেউ কোনোদিন বুঝবে না আমায়

–তোমার গার্লফ্রেন্ডকে বলেছ কথাটা?

মাঝখানে বাধা পেয়ে একটা অস্বস্তি চেপে ধরে শুভকে। চোখ নামিয়ে বলে, –আমার গার্লফেন্ড নেই। আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় শুভ। পারমিতা অপেক্ষা করে। সময় এসে গেছে। একটু পরেই জ্বালামুখ খুলে আসবে। গলগল করে বেরিয়ে আসতে চাইবে লাভাস্রোত। পারমিতা কিছুতেই তা হতে দেবে না। সে উঠে দাঁড়ায়। আশ্চর্য এক মুদ্রায় হাত দুটো ছড়িয়ে দেয় সোফার ওপর। মনে হয় তার ঢিলেঢালা গাউনটা কাঁধ থেকে খসে পড়বে যে কোনো মুহূর্তে। কিন্তু, তা হওয়ার নয়। পারমিতা নিশ্চিন্ত। কারণ সে জানে খাঁজে খাঁজে লুকনো সেফটিপিনগুলোর কথা।

জানে না শুভ। সে উন্মুখ। পারমিতা...পারমিতা! আমি তোমাকে– বলতে বলতেই থেমে যায়?– কি হল কি সুইটহার্ট! এত দেরি কিসের! অচেনা এক পুরুষ কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে দেয় পারমিতা। পর্দা সরিয়ে ঢোকে রণজয়। গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। উস্কোসুস্কো চুল। পারমিতা ঘেঁষে দাঁড়ায় তার বুকের কাছাকাছি। বললাম তো যাচ্ছি! তুমি গিয়ে শোও।

–না না এক্ষুনি। আমি আর ওয়েট করতে পারছি না।

—ইস্ আস্তে! অসভ্য কোথাকার। পারমিতা আলতো চাপড় মারে রণজয়কে বুকে। তারপর ঘুরে তাকায়। —তুমি একটু বসো শুভ। জাস্ট আধঘন্টা। রাগ করো না। প্লিজ!

শুভর মুখে কথা নেই। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে দেখে— একটা পুরুষ পারমিতার কোমর জড়িয়ে দোতলায় উঠে লাথি মেরে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে পারমিতা। রাস্তার ওপর চোখ। শুভ চলে যাচ্ছে। পিঠের ব্যাগটা হাতে ঝোলানো অবহেলায়। ক্লান্ত-বিমর্ষ গতি। অন্তত আর একবার সে বাড়ি গিয়ে সবকিছু তছনছ করবে। মুছে ফেলবে পারমিতার সমস্ত চিহ্ন। সারা শহর যখন তার কথা শোনার অপেক্ষায়, তখন শুভ হয়তো তার নামটাও শুনতে চাইবে না। অনেকদিন, হতে পারে সারা জীবন সে ঘৃণার চোখে দেখবে পারমিতাকে।

—একসেলেন্ট মিতা! ইউ আর সাকসেসফুল। অকৃত্রিম মুগ্ধতা ঝরে পড়ে রণজয়ের ভাষায়। পারমিতা শুনেও শোনে না। তাড়াতাড়ি নেমে আসে নীচে। সেই টেবিলটার কাছে। ফুলের পাশে রাখা গ্রিটিংস কার্ডটা তুলে নেয়। তারপর ধপ করে বসে পড়ে সোফায়। আশ্চর্য সুন্দর একটা কোলাজ। সাঁটানো পেপার কাটিংয়ে শব্দের পর শব্দ। লাইন অক্ষর। প্রশ্নচিহ্ন। মাঝখানে ফুটে রয়েছে একটা মুখ। পারমিতার ভীষণ চেনা লাগে মুখটা। আর ওই চোখ দুটো। সবকিছু ভুলে শুধু তাকেই দেখছে।

—মিতা, তোমার ফোন।

পারমিতা শিথিল হাতে রিসিভারটা কানে চেপে ধরে, পারমিতা, সুমনা বলছি। শুভর মা।

—ও হ্যাঁ—আপনার কাজ হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে গলা কেঁপে ওঠে পারমিতার।

সুমনাকে নিশ্চিন্ত মনে হয়। —ধন্যবাদ। আপনার ফিটা কীভাবে...হ্যালো...শুনছেন...হ্যালো!

রিসিভারটা ছিটকে ঝুলে পড়েছে। —কী হল মিতা! রণজয়ের চোখেমুখে বিস্ময়। পারমিতা যেন ঠিক নিজের মধ্যে নেই। মনে হয় সুদূরে কাউকে সে খুঁজছে। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে আপনা থেকেই, —তুমি বুঝবে না রণজয়...।